মুংলি বুধির গল্প

প্রদীপ সেনগুপ্ত

একটা গাছ আছে। আর আছে একটা মাঠ। ওই মাঠের মাঝখানে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার বিশাল গুঁড়ি আর অনেক ডালপালা মাঠটাকে ছায়ায় ভরিয়ে রেখেছে। অনেক দিন আগে, যে বছর কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখীবন্ধন উৎসব করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য সেই বছর কয়েকজন দেশপ্রেমী এই শিরিষ গাছটা লাগিয়েছিলেন এই ঘটনাটা সকলের মনে রাখার জন্য। গাছটার বয়স প্রায় একশো বছর হতে চললো।

মাঠটাও অনেকদিনের পুরোনো। ভারত যে বছর স্বাধীন হল সেই বার পাকিস্থান থেকে ঘর ছেড়ে আসা মানুষেরা আমাদের জাতীয় পতাকা তুলেছিল এই মাঠের এক কোনে। তার পর এখানে কলোনি গড়ে উঠলো। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। কলোনি আর নেই। সেই জায়গায় বড়বড় বাড়ি উঠে আকাশ ঢেকে দিয়েছে। মাঠ ঘিরে অনেক বড়বড় বাড়ি।

সেই একটা বাড়িতে থাকে দুই বোন। মুংলি আর বুধি। ওদের আরও নাম আছে। যেমন মুংলির নাম মেঘাবতী আর বুধির নাম নববর্ষা। দাদা ওদের নাম দিয়েছেন লা**বনি** আর সা**জুনি**। ওরা একই দিনে জন্মেছে, একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। এখন ওরা আর কথায় কথায় কাঁদে না। ওরা তো আপার নার্সারি ক্লাসে পড়ে। বড় হয়ে গিয়েছে। ওই গাছটার সাথে ওদের খুব ভাব। রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় ওরা গাছটাকে বলে যায়, খুব ভালো হয়ে থেকো সারাদিন। গাছটাও ডালপালা

নেড়ে ওদের বলে, বিকেলে খেলতে এসো কিন্তু। শিরিষ গাছটা মুংলি বুধির খুব বন্ধু। তাই গাছের একটা ডাল ওদের তিনতলার বারান্দায় এসে পড়েছে। বসন্তে অজস্র শিরিষ ফুল ওদের বারন্দায় ঝরে পড়ে। পাড়ায় বড় বড় বাড়ির ভীড়ে এই মাঠ আর ওই গাছ সকলের খুব প্রিয়। পাড়ার বড় বড় লোকেরা সবাই চাইছে এই মাঠে একটা ছোটোদের পার্ক হোক। কিন্তু তাতে নাকি অনেক বাধা। যারা বড় বড় বাড়ি বানায় তারা চাইছে এখানে অনেক বড় বাড়ি তুলতে। তাই গাছটাও তারা কেটে ফেলবে। শুনে মুংলিবুধির কান্না পায়।

মুংলিবুধি রোজ রাত্রে দামমার কাছে গল্প শোনে। বনের গল্প। পাহাড়ের গল্প, বনের সেরা বন সুন্দরবনের গল্প। আর বনের রাজা দক্ষিণরায়ের গল্প। গল্প শুনতে শুনতে ওরা ঘুমায়। ওদের ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে বনের বাতাস, নীল পাহাড় আর শিরিষ গাছের শন শন শব্দ।

একদিন রাত্রে দুই বোনের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ওরা শুনতে পেলো জানালার নীচে কয়েকজন লোক কথা বলছে মাঠের মাঝে। একজন বলছে, আজ রাত্রেই গাছটাকে কেটে ফেলব। একটু পরেই করাত আর লোকজন চলে আসবে। সবাই মিলে আজ রাতেই গাছটা অন্য খানে নিয়ে চলে যাব। অন্য একজন বলছে গাছটার ভালই দাম পাওয়া যাবে। অনেক কাঠ আছে এটায়। প্রায় একশো বছর বয়স হবে এই গাছের। কিন্তু কাজটা চুপি চুপি করতে হবে কেউ যেন টের না পায়। শুনে দুই বোনের মন খারাপ হয়ে গেলো। গাছটা তাদের এতো দিনের বন্ধু। তাকে যদি কেউ কেটে ফ্যালে তবে কষ্ট হবে না ? কার নীচে বসে বিকেল বেলায় তারা খেলা করবে ?

মুংলি বললো, বোন চল, আমরা বনের রাজা দক্ষিণরায়ের কাছে যাই। দক্ষিণরায় গাছেদের বন্ধু। তিনি ঠিক আমাদের বন্ধুকে রক্ষা করবেন। বুধি বললো, কি করে যাবি ? মুংলি বললো, ওই দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন। বনের রাজা ওখানে থাকেন। আমরা এক দৌড়ে তাঁর কাছে চলে যাব। দুই বোনে চুপি চুপি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। মা বাবা ঘরে ঘুমে অচেতন। বারান্দায় শিরিষ গাছের ডালটা তাদের ডাকছে। ওরা গাছের ডালে চড়ে বসতেই ডালটা তাদের মাঠে নামিয়ে দিল। নেমেই দুজনে আকাশে বৃশ্চিক রাশির দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড় দিল।

দক্ষিণ দিকে আদিগঙ্গার খাল। খাল পেরিয়ে ব্রহ্মপুর। সেই ব্রহ্মপুরের

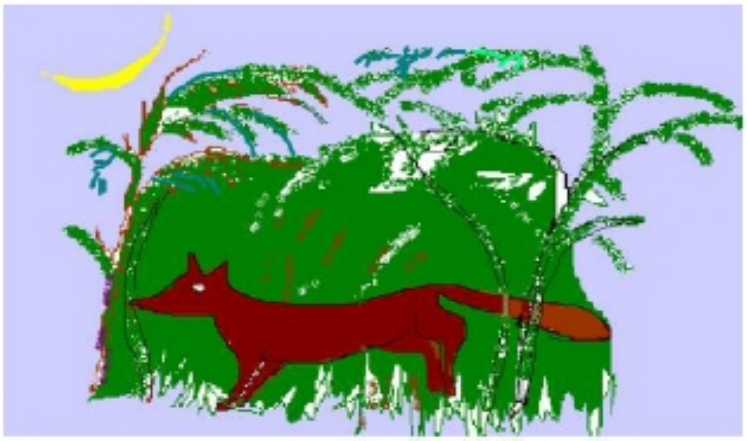

বাঁশবনে থাকে দুই শেয়াল। দুই বোন কে দেখেই পথ আগলে দাঁড়ালো শেয়ালেরা, এতো রাত্রে তোমরা দুই বোনে কোথায় চলেছ ? শেয়াল কে দেখে ওরা একটুও ভয় পেল না। কারণ ওরা তো যাচ্ছে একটা ভাল কাজে। তাই শেয়াল কে বললো, শেয়াল মামা আমাদের দক্ষিণরায়ের বাড়ি যাওয়ার পথ বলে দাও। আমরা আমাদের বন্ধু শিরিষ গাছকে বাঁচাতে চাই। শেয়াল বললো, সে তো অনেক দুরের পথ। মাঝে সাতটা নদী পার হতে হবে। তোমরা তো সহজে যেতে পারবে না। তাই শুনে মুংলি বললো, তা হলে কি উপায় ? শেয়াল বললো, একটা উপায় আছে। আমার বন্ধু ভোঁদরকে খবর দিতে হবে। চলো সবার আগে নদীর দিকে যাই। তবে নদী অনেক দূর। তোমরা হেঁটে অত দূর যেতে পারবে না। আমাদের পিঠে উঠে বস। আমরা তোমাদের এক দৌড়ে নদীর কাছে নিয়ে যাব। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে সুন্দরবনে যাব।

দুই বোন শেয়ালের পিঠে উঠে বসলো। শেয়াল সোজা পুব দিকে বানতলা খাল ধরে দৌড় দিল। বানতলা পেরিয়ে বাসন্তী যাওয়ার পাকা রাস্তা ধরে শেয়াল এক দৌড়ে চলে এলো ঘটকপুকুর। ঘটকপুকুর পার হয়ে বিদ্যাধরী নদী। কলকাতার ময়লাজলের খাল যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে শুরু হচ্ছে বিদ্যাধরী নদী। নদীর ধারে একটা ছই দেওয়া ছোট্ট নৌকো চাঁদের আলোয় তির তির করে ভাসছে। শেয়ালদের দেখে জল থেকে গা ঝেরে ভোঁদরবাহাদুর উঠে এলেন। শেয়ালদের পায়ে গড় করে বললেন, বোট রেডি। শুশুকমশাই আপনাদের বোট টেনে নিয়ে যাবেন। মুংলি বুধি তাকিয়ে দেখলো নদীর জলে কালো শুশুকের পিঠটা একবার ঘাই মেরে উঠলো।

শেয়াল বললো, তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে পড়। নদীতে ভাঁটা এসে গেলে

আর যাওয়া যাবে না। ওরা উঠতেই নৌকা ছেড়ে দিল। শুশুকের টানে তর তর করে এগিয়ে চললো নৌকা। ঘটকপুকুর পার হয়ে মালঞ্চ বন্দর। মাছের আড়ত। আড়ৎ পাহারা দেয় দুই কুকুর। জলে নৌকার আওয়াজ পেয়ে হেঁকে উঠলো, কে যায় ? শেয়াল দূর থেকে জানালো, আমরা তীর্থ করতে চলেছি বাবা। কুকুর দুজন একবার ঘেউ করে চুপ করে গেলো। শেয়াল বললো এর পরে পড়বে ন্যাজাট বন্দর। ওখানে কাটা খাল এসে বিদ্যেধরীর সাথে গিয়ে মিশেছে। আমরা এবার যাব দক্ষিণে। অন্য শেয়াল বললো আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। ন্যাজাট বন্দর দেখতে দেখতে পেছনে চলে গেলো। ধামাখালি, ভোলাখালি, পার হয়ে দূরে দেখা গেলো একটু আলো। শেয়াল জানালো সন্দেশখালি এসে গিয়েছে। এর পর ডাঁসা নদী মিশেছে। আর একটু এগিয়েই রায়মঙ্গলের বড় গাঙ। কুমিরের আস্তানা। বুধি বললো, বোন জলে পা

ডোবাস না। কুমিরে টেনে নিয়ে যাবে।

রায়মঙ্গলের গাঙ বিরাট চওড়া। জোয়ারের সময় দুই পার দেখা যায় না। রায়মঙ্গলের পরে আরও বড় গাঙ। নাম শুনলেই ভয় লাগে। দুই বোন ভাবছে কতক্ষণে দক্ষিণরায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে তারা। দেরী হলে তো গাছটাকেও বাঁচাতে পারবেনা। ঘুমন্ত শেয়াল একবার হাই তুলে বললো, রাত কত হোলো ? অন্য শেয়াল বললো, রাত বেশি নয়। ভোরের আগেই পৌঁছে যাবো। ওদের নৌকা দেখতে দেখতে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার শুরু হবে আসল সুন্দর বন।

নৌকা ধীরে ধীরে নদীর ধারে একটা ঘাটে এসে ভিড়লো। এই ঘাট মানুষের চলাচলের জন্য নয়। কেবল মাত্র চারপেয়েরাই এখানে চলাফেরা করে। চাঁদের মরা আলোয় সুন্দরবনের দৃশ্য দেখে মুংলি বুধি মুগ্ধ হয়ে গেলো। চার দিকে কতরকমের গাছ। কতরকমের ফুল ফুটে রয়েছে। শেয়াল বললো, এই বনে অনেক নিয়ম কানুন আছে। এই বন পাহারা দেয় বড়মিঁয়ার শাকরেদরা। টিকিট ছাড়া বনে ঢোকা যাবে না। চলো আগে বনবিবির কাছ থেকে টিকিট নিয়ে আসি।

ডাঙায় কাদা । পা ডুবে যাচ্ছে। ওবা কোনও রকমে নৌকা থেকে তীরে নামলো। সুন্দরবন সত্যিই সুন্দর। কত রকমের গাছ। গরান, গেঁও, সুন্দরী, হেঁতাল, আরো নানা রকমের গাছ। কতো রকমের ফুলের সুগন্ধ। এই বন পেরিয়ে আরও একটু গেলেই বনবিবির থান। মুংলি বুধি অবাক হয়ে দেখলো আকাশ চাঁদ আর তারার আলোয় ভরে গিয়েছে। বনের মধ্যে সুন্দর পথ গিয়ে মিশেছে একটা পুরোনো মন্দিরের সামনে। ওটাই বনবিবির মন্দির। সবাই ওখানে গিয়ে আগে পুজো দেয়। তারপর বনে ঢোকে। ওরাও ধীরে ধীরে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের দেখে বনবিবি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাঁদের আলোয় তাঁর মাথার মুকুট ঝলমল করে উঠলো। মুংলি বললো কি সুন্দর, দেখেছিস ?

বনবিবি ওদর দেখে বললেন, কী ব্যাপার এতো রাত্রে আমার বনে মানুষের বাচ্চা কেন ? শেয়াল তাড়াতাড়ি গড় হয়ে প্রণাম করে বললো, পেন্নাম হই মা ঠাকুরুন। এনারা কুদ্ঘাটের মুংলি আর বুধি। আমি ব্রহ্মপুরের শেয়াল। এনাদের পথ দেখিয়ে এনেছি। এনারা এয়েছেন বনের রাজা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আপুনি দয়া না করলি তো এনারা কেঁদে ভাসাবেন মা।

বনবিবি তাড়াতাড়ি বললেন, থাক থাক, আগে বল ব্যাপারটা কি। বন বলে কি আর আইন কানুন নেই ? যাকে তাকে নিয়ে এলেই হল? তোমরা চারপেয়েরা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছ শহরে থেকে থেকে। মানুষের সাথে থেকে মানুষের মত বেআইনি কাজ শুরু করে দিয়েছ। এভাবে এদের এখানে আনা ঠিক হয় নি একেবারেই। ওদের এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

শেয়াল বললো, সব জানি মা, কিন্তু এনারা এয়েচেন একশো বছ্ছরের পুরানো একটা গাছকে বাঁচাতে। দক্ষিণরায়ের সাথে এনাদের দেখাটা করিয়েই দিতে হবে মা। বনবিবি বললেন, শুনতে তো ভালোই লাগছে। কিন্তু মানুষ তো, বিশ্বেস নেই। যাই হোক আগে পুজাটা তো সারো। শেয়াল বললো, কই গো মুংলি বুধি কি এনেছ, মায়ের পূজাটা দাও।

বুধি তাই শুনে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, কই আমাদের কাছে তো কিছুই নেই। কি দিয়ে পুজা দেবো ? বনবিবি বললেন, কিছুই নেই ? তা হলে তো মুশকিল। টিকিট কাটতে গেলে কিছু তো লাগবে। আমিই বা হিসাব মেলাব কি করে? টিকিট ছাড়া তো বনে ঢোকা চলবে না।

শেয়াল বললো, তুমিই মা একটা উপায় বলে দাও, দেরি হলে গাছটাকে বাঁচানো যাবে না।

বনবিবি কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, তা হলে একটা কাজ কর। তোমরা দুইজনে কাদা দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে নিয়ে এস। যদি পছন্দ হয় তবে টিকিট দেওয়া যাবে।

কি আর করা। দুই বোন আবার নদীর কাছে গিয়ে কাদা নিয়ে এলো। মুংলি কাদা দিয়ে একটা মাছ বানাতেই সেটা জ্যান্ত হয়ে নদীতে পালিয়ে গেলো। বুধি বানালো একটা ব্যাঙ। সেঁাও লাফাতে লাফাতে বনেরভেতর ঢুকে গেল।

বনবিবি তখন খুশি হয়ে বললেন, তোমরা আমার বনে দুজন বসিন্দা

বড়িয়ে দিয়েছ। এতেই আমি খুব খুশি হয়েছি। এই নাও তোমাদের টিকিট। বনবিবি ওদের হাতে দুটো ধপধপে সাদা সমুদ্রের ঝিনুক তুলে দিলেন। আর বললেন, এহ টিকিট হাতে থাকলে তোমাদের কেউ কিচ্ছু বলবেনা।

শেয়ালেরা বললো আমাদের আর ভেতরে যাবার দরকার নেই। তোমরা গেলেই চলবে। আমরা বরং একু কাঁকড়া টাকড়া ধরার চেষ্টা করি। তোমাদের জন্য সন্ধ্যা থেকে কিছুই খাওয়া হয় নি। শেয়ালরা দুইজনে নদীর পাড়ে চলে গেলো। বনবিবির পোড়ো মন্দির পেরিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বনবিবিও মন্দিরের দরজায় আগড় দিয়েছেন। দুই বোন ভাবছে কোন দিকে রাজা দক্ষিণরায়ের প্রাসাদ। সামনেই ঘন জঙ্গল। কোন দিকেই বা যাবে, আর কেই বা তাদের রাস্তা বলে দেবে।

বুধি বললো, বোন, চল আগে আমরা বনের ভেতরে ঢুকে পড়ি। তারপরে নিশ্চয়ই একটা পথ পাওয়া যাবে। সবধানে চল। বড্ড কাদা এখানে। কাদায় পা ঢুকে যাচ্ছে একেবারে। হাঁটাই যাচ্ছেনা। তার ওপর ঘন অন্ধকার, ভীষণ জঙ্গল।

দুই বোন জঙ্গলে ঢুকতেই দুই বিশাল সাপ এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। তোমরা কারা হে ? এত রাত্রে জঙ্গলে ঢুকেছ কার হুকুমে? তোমাদের টিকিট কোথায় ? ওরা তাড়াতাড়ি ঝিনুক দুটো বের করে দেখালো। সাপেরা তাই দেখে বললো, হেঁ হেঁ এ যে দেখছি ইস্পেশাল টিকিট। পেলে কোথায়? একেবারে সোজাসুজি রাজা দক্ষিণরায়ের দর্শণের টিকিট। মনে হচ্ছে তোমরা যে সে লোক নও। তা এসো আমাদেব পিছু পিছু। সাপেরা চলতে চলতে হিস হিস করে কথা বলে যেতে থাকলো, শোনো হে মেয়েরা, বনে এসেছ বেশ কথা। কিন্তু রাজদর্শণের পরে আমাদের দর্শনি

দিতে ভুলো না। জানো তো আমরা যে সে সাপ নই। আমারই উর্ধতন তিন হাজার পুরুষ আগে কালসাপ লখিন্দরকে লোহার বাসর ঘরে কামড়েছিলো, বেহুলা তাকে নিয়ে ভেলায় করে শিবের কাছে গিয়েছিলো।

সে গল্প জানো তো। আমি সেই সাপেরই বংশধর।

অন্য সাপটা তাড়াতাড়ি বললো, আমিও কম যাই কিসে ? শিবের আদেশে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিলো শিবের মাথার যে সাপ। তিনি আমারই তিনহাজারতম পুর্বপুরুষ। কত বড় বংশ আমাদের। রাজা তাই বিশ্বেস করে আমাদের দারোয়ান রেকেচেন। চলো একটু পা চালিয়ে হাঁটো। তোমরা মাত্র দুটো পা নিয়ে কেমন করে যে চলো। দেখে আমাদের হাসি পায়।

মুংলি বললো, রাজা মশাইয়ের দেখা এখন পাবো তো ? সাপেরা বললো ক্যানো পাবে না ? তোমাদের কাছে ইস্পেশাল টিকিট আছে না ? ওই টিকিট দেখলেই রাজা তোমাদের দর্শণ দেবেন।

সাপেরা এগিয়ে যেতে থাকলো আর মুংলি বুধি তাদের পেছন পেছন আরও গভীর বনে প্রবেশ করলো। গভীর বনে আরও কত রকমের গাছ। গাছের নীচে আরও কত ছোটো ছোটো গাছ। গাছ জড়িয়ে লতা উঠেছে। গরান গাছের শ্বাসমূল কাদার ওপর জেগে আছে। এখন বনের জন্তু জানোয়ারদের কাজের সময়। ওরাও বেরিয়েছে নানা কাজে। বড় বড় দাঁতালো শুয়োর, কালো কালো গোসাপ, আর ছোটো হরিনের দল খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।আরও কিছু দুরে বনের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কোনো বড় গাছ নেই। এখানে ওখানে বড় বড় পাথর আর ইঁটের পাঁজা। একটা ভাঙ্গা নৌকা উল্টে পড়ে আছে। ইঁটের পাঁজার ফাঁক দিয়ে বট গাছের চারা গজিয়েছে। তার মধ্যে মরা চাঁদের আলো খেলা করছে।

এখানেই চাঁদ সওদাগরের পুরোনো ভিটে ভেঙ্গে চুরে পড়ে আছে কত হাজার বছর ধরে। হেঁতালের বন গজিয়ে উঠেছে চার ধারে। সেখানেই এক পুরোনো অট্টালিকায় রাজা দক্ষিণরায়ের দরবার। সেখানে ঘরে ঘরে গুলবাঘ, মেছোবাঘ, কেঁদোবাঘ, সব বাঘবাঘিনীরা রাজার খিদমত খাটে। রাজা দক্ষিণরায় বড় বড় মহাবাঘদের নিয়ে সভা আলো করে বসে থাকেন।অট্টালিকার পাশে ভাঙ্গা মন্দির। মনসাতলা। মুংলি বুধি তো চাঁদ সওদাগরের গল্প জানে না। তাই ওরা অবাক হয়ে ভাবলো এই বনের মধ্যে এত বড় বাড়ি কে তৈরী করে রেখেছে। সাপেরা বললো তোমরা যে ঘাটে নামলে ওই ঘাটেই চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর বাঁধা থাকতো। সাগর পেরিয়ে বানিজ্য করতে যেতো।

রাজার তখন বিশ্রামের সময়। মস্ত বড় একটাঘরে বাজা দক্ষিণরায় গদির ওপর শুয়ে একটু ঢুলছিলেন। সারা সন্ধ্যা বনের নানা জন্তু জানোয়ারের নালিশ শুনে তার মিমাংসা করে সবে একটু বিশ্রাম করতে বসেছেন এমন সময়ে মুংলি বুধি সোজা রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। রাজার চেহারা দেখে দুই বোন তো অবাক। সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায়ের বিরাট চেহারা। হাঁড়ির মত মস্ত একটা মুখ। প্রকান্ড দেহ। লম্বা লেজ। গায়ে আবার কালো কালো ডোরা কাটা। মুলোর মত দুই পাটি দাঁত। মুখের দু পাশে লম্বা লম্বা গোঁফ। মাথার ওপর সোনার মুকুট। রাজা ওদের দেখেই হুংকার দিয়ে উঠলেন, তোমরা কেন এখানে এসেছ ? কে তোমাদের আসতে দিয়েছে? জানো, এটা রাজার শোয়ার ঘর? মুংলি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, রাজামশাই আমাদের অন্যায় হয়েছে।কিন্তু আমাদের আর উপায় ছিলো না। আমাদের বন্ধু শিরিষ গাছকে বাঁচাতেই হবে।

শুনে রাজা দক্ষিণরায় উঠে বসলেন। বিশাল এক ডাক ছেড়ে বলে উঠলেন, কি বললে ? কোথাকার গাছ বাঁচাতে হবে ? কত নমবর লাট ? কোন বাঘের এলাকা ? বুধি তড়াতাড়ি বললো, বাঘের এলাকা নয়, মানুষের এলাকা। কলকাতা শহর। তাড়াতাড়ি চলুন রাজামশাই, আপনাকে আমরা কলকাতায় নিয়ে যেতে এসেছি।

শুনে রাজা আবার শুয়ে পড়লেন। ওরে বাবা কলকাতা শহর? ধুলো আর ধোঁয়ায় ভর্তি। ওখানে কে যাবে ? আমি বাবা যেতে পারবোনা।

বুধি বললো, আমরা যে খুব আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। একমাত্র আপনিই পারবেন আমাদের গাছটাকে কাঠুরেদের হাত থেকে বাঁচাতে। ওরা আজ রাত্রেই গাছটাকে কেটে ফেলবে। মুংলি বুধির দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগললো। তাই দেখে রাজার মনে খুব দুঃখ হল। বললেন, ঠিক আছে তোমরা যখন বলছ, তা হলে চলো যাই।কিন্তু আমার যাওয়ার জন্য তোমরা কি ব্যবস্থা করেছো ? কলকাতা অনেক দূর। সেখানে তো যেতেঅনেক দিন সময় লেগে যাবে। মুংলি বললো আমরা নৌকা নিয়ে এসেছি। নৌকা চড়ে আমরা কলকাতায় যাব।

রাজা বললেন, বেশ তা হলে অসুবিধা হবে না। রাজা, আর দুই বোন রওনা হলো। নদীর ধারে গিয়ে দুই শেয়াল তাদের সাথে যোগ দিলো। নদীর ধারে শুশুক বিশ্রাম করছিলো। সে গা ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে নৌকার দড়ি ধরে টান মারলো। কিন্তু নৌকা আর এগোয় না। শুশুক বললো নদীতে ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। উজানে যাওয়া যাবে না। জোয়ার আসতে সেই সকাল হয়ে যাবে। রাজা বললেন, তা হলে উপায় ? ওহে ব্রহ্মপুরের শেয়াল কিছু একটা ব্যাবস্থা কর। সকাল হয়ে গেলে তো চলবেনা।

শেয়াল বললো উপায় একটা আছে, আমরা সমুদ্দব হয়ে গঙ্গাসাগর ঘুরে যাব। নদীর শুশুক আমাদের সমুন্দুর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। শুশুক বললো কাকদ্বীপে আমার সম্বন্ধী থাকেন। তিনি আমাদের সুমুদ্দুরের পথ বলে দেবেন। রাজা বলললেন, বেশ তাই হোক।

শুশুক নৌকা টেনে নিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আকাশের এক ফালি চাঁদের সামান্য আলোয় নদীর ঘোলাজল কালো দেখাচ্ছে। সামনে কিছুই দেখা যায় না।

সামনে বিশাল বঙ্গোপসাগর। সাগরের মধ্যে কত দ্বীপ। নয়াচর, কাকদ্বীপ, সোনাদ্বীপ, মীন দ্বীপ। সাগরে পড়তেই সমুদ্রের শুশুক এসে ওদের যাত্রায় যোগ দিলো। সে এবার সমুদ্রের পথ দিয়ে নৌকার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চললো। ধীরে ধীরে সুন্দরবন আঁধার দিগন্তে মিলিয়ে গেলো। এখন সামনে শুধুই সমুদ্র। বড় বড় ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আলো ঝিকমিক করছে। বহু দুরে ঘন নীল আকাশ এসে সমুদ্রের সাথে মিশেছে। আকাশের বুকে তারা ঝলমল করছে। ভাঙ্গা চাঁদ ডুবু ডুবু। তার মরা আলো সমুদ্রের বুকে পড়েছে। নৌকার গলুইয়ে বসে শেয়াল গঙ্গার

শুশুকের সাথে সুখ দুঃখের গল্প জুড়েছে। বনের রাজা দক্ষিণরায় নৌকার ছইয়ের ভেতরে বসে ভাবছেন গাছকাটিয়েদের এবার কড়া শাস্তি দিতে হবে।

আরও কিছু দূরে এগোতেই অনেক দূরে একটা আলো দেখা গেলো। শেয়াল বললো ওটা সাগর দ্বীপের বাতিঘরের আলো। সমুদ্রের নাবিকদের পথ দেখায়। সামনেই স্যান্ডহেড। সমুদ্রের শুশুকের এর পরে যেতে মানা আছে। নদীর শুশুক এবার নৌকা টানবে। রাজাকে নমার করে সমুদ্রের শুশুক বিদায় নিলো। কলকাতা এখনও বহু দূর। সাগর স্নানের ঘাট, কপিলমুনির আশ্রম পার হয়ে নৌকা এবার হলদি নদীর মোহানায় পড়লো। এখান থেকে বহু দূরে হলদিয়া বন্দরের আলো দেখা যাচ্ছে। শেয়াল বললো এর পরেই ডায়মন্ডহারবার। তারপর ফলতা।
আমরা কলকাতার কাছাকাছি এসে গিয়েছি।

রাজার বোধ হয় একটু ঝিমুনি এসেছিলো। হঠাৎ হুংকার দিয়ে বললেন শেয়াল, আমরা কলকাতায় ঢুকবো কোথা দিয়ে ? শেয়াল বললো, কেন মহারাজ, টালির নালা দিয়ে ঢুকবো। আর বেশী দেরি নেই। সামনেই ফলতা। দেখতে দেখতে ফলতা পার হয়ে ফুলেশ্বরের কাছে নৌকা বাঁক নিলো কলকাতার দিকে। ফুলেশ্বর থেকেই নদীর দুই ধারে ঘন বসতি । বড় বড় কলকারখানা। কিন্তু সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ জানতেই পারছেনা সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায় কলকাতায় আসছেন মুংলি বুধির সাথে। নৌকা তর তর করে এগোচ্ছে। বজবজের কাছ থেকে নদী বাঁক নিয়েছে কলকাতার দিকে। আর সেই বাঁক ঘুরতেই দেখা গেলো বিদ্যাসাগের সেতু আর হাওড়াপুলের আলো।

খিদিরপুরের কাছে শুরু হয়েছে টালির নালা। আদিগঙ্গার খাল। এখানে এসে রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এখানেই আমার বনের প্রজাদের চিড়িয়াখানায় আটকে রেখেছে মানুষেরা। কত বড় অন্যায় করছো বলতো তোমরা। মুংলি বললো আমি বড় হয়ে সব জন্তুকে চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে আসবো। রাজা দক্ষিণরায় বললেন ততদিন কি আর বন বলে কিছু থাকবে ? সব কেটে ছারখার করে দেবে। বুধি বললো, আমরা তা কক্ষনো হতে দেবো না। আমরা নতুন করে সব বন তৈরী করবো।

খিদিরপুর ঘাটের পরে আলিপুর ঘাট, তার পর ভবানীপুর ঘাট, তার পর আদি গঙ্গার কালিঘাট ও শিরিটির শ্মশান ঘাট।শিরিটি পেরোলেই কুঁদঘাট। কুঁদঘাটে এসে তরী ভিড়লো। এর পর আর নৌকায় যাওয়া যাবে না। হেঁটে যেতে হবে।

বুধি বললো রাজামশাই নামুন। মাটিতে নামতেই রাজা দক্ষিণরায় নিজমূর্তি ধারণ করলেন। শরীর ফুলে দুইগুন হলো। প্রকান্ড হাঁ করে একটা হুংকার ছাড়লেন। তারপর বললেন, আমাকে নিয়ে চল কোথায় কে গাছ কাটছে, তার মুন্ডু চিবিয়ে খাব। এই সব এলাকা আমার রাজ্য ছিল। বড় বড় কেঁদোবাঘেরা এখানে ঘুরে বেড়াতো। এখানে হোগলা আর উলুর বন ছিল। শামুকখোল আর গগনভেড় পাখীরা এখানে বাস করতো। বড় বড় ময়াল সাপের আস্তানা ছিল। মানুষেরা আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আর আমার সাধের সুন্দরবন, তাও শেষ করে এনেছে।

দক্ষিণরায়ের আক্ষেপ শুনে শেয়াল বললো, এখানেই বা কি কম অত্যাচার চলছে? অত বড় বাঁশবন তাও দিলে সাবাড় করে ? এখন আমরা ছানা পোনা নিয়ে যাই কোথা ? সুন্দরবনে গিয়ে কত দিন পরে দটো কাঁকড়া খেয়ে প্রান বাঁচালুম। এর কোনো বিহিত হয় না?

বুধি বললো, তাড়াতাড়ি চলুন রাজামশাই, ভোর হয়ে এলো প্রায়। ওরা তখন সেই মাঠের সমনে এসে দাঁড়ালো। গাছ কাটার আয়োজন তখন প্রায় শেষ। মস্ত একটা করাত নিয়ে দুজন লোক গাছ কাটার জন্য তৈরি। মুংলি বললো ,ওই দেখুন, ওই লোক গুলো গাছ কাটতে যাচ্ছে। রাজা দক্ষিণরায়ের অত বড় দেহ দেখেই তো লোক দুটোর প্রাণ উড়ে গেলো। গাড়ি তে যে বসে ছিলো সে তো গাড়ি নিয়ে তৎক্ষনাৎ পালালো। অন্য লোক দুটো যারা গাছ কাটতে এসেছে তারা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। রাজা সামনে এসে বললেন আরে এরাই তো সুন্দরবনে গাছ কাটতে যায়। এদের গায়ে সুন্দরী গাছের গন্ধ লেগে রয়েছে। আজ আর আমি এদের ছাড়বোনা। রাগে রাজার দেহ আরও বড় হতে থাকলো। তারপর বিশাল এক হুংকার দিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুজনেরই ঘাড় কামড়ে ধরে পিঠেরওপর ফেললেন। রাজা বললেন আর কেউ এই গাছ কাটতে সাহস

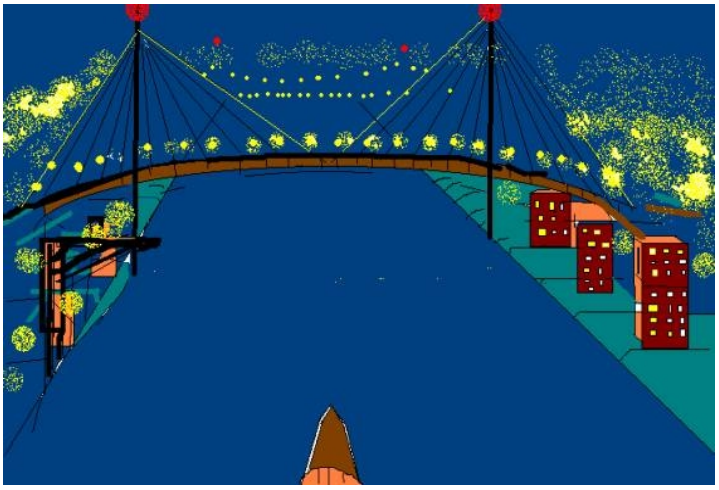

করবেনা। আমি এদের সুন্দরবনে নিয়ে বন্দী করে রাখবো। রাজা তারপর লোক দুটো কে নিয়ে সুন্দর বনের দিকে দৌড় দিলেন।

চারদিক শান্ত হয়ে এলো। ঠান্ডা হাওয়ায় শিরিষ গাছের পাতা কাঁপতে থাকলো। শেয়ালেরা বললো, তা হলে এবার আমরা আসি। তোমরা ভালো থেকো। শেয়ালরা তাদের আস্তানার দিকে রওনা হলো। মুংলি বুধি হাত নেড়ে শেয়ালদের বিদায় দিলো। দুই বোন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো শুকতারা ফুটবো ফুটবো করছে। আকাশে ফিকে আলোর রেখা। এবার তো ঘরে ফিরতে হবে। শিরিষ গাছ তার ডাল নামিয়ে ধরলো। তাতে চড়ে মুংলি বুধি ফের নিজের ঘরে গিয়ে মা বাবার পাশে চুপটি করে শুয়ে পড়লো। মা বাবা টেরই পেলো না ওরা কত দূর বেড়িয়ে এলো।

সকাল বেলায় ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো গানের সুরে। কোথায় যেন গান হচ্ছে, মরু বিজয়ের কেতন উড়াও। গান শুনে দু বোন দৌড়ে বারান্দায় এলো। মা অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেছে। ওদের দেখে বললো, কি ঘুম ভাঙ্গলো ? স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হও। তারপর খুব খুশি হয়ে বললো, জানিস, এই মাঠে তোদের জন্য একটা পার্ক হবে। তাই বৃক্ষরোপণ উৎসব হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা গাছের চারা লাগাচ্ছে।

শুনে মুংলি বুধির খুব আনন্দ হলো। পার্ক হলে আর কেউ কোনো দিন শিরিষ গাছকে কাটতে পারবেনা।ওরা তাড়াতাড়ি ছুটলো তৈরী হতে, কারণ আজ স্কুলে যাওয়ার আগে নিজের হাতে ওরা একটা গাছের চারা লাগাবেই।

ছবি: প্রদীপ সেনগুপ্ত ২০০৩